কদমখালিতে বেদখল লালন-মেলা

পিয়ালী মিত্র

যে দু-একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও সৃজনী কাজ পশ্চিমবঙ্গে এখনো হতে পারছিল তার মধ্যে নদীয়া জেলার কদমখালির লালনমেলা একটা । সমস্ত দিক থেকে বাউলদের এতো বড় মেলা দু-বাংলায় আর কোথাও এখন নেই । শান্তিনিকেতন, কুষ্ঠিয়া বা কেঁদুলি, কোথাও না । একথা আর অজ্ঞাত নেই যে কুষ্ঠিয়ায় লালন ফকিরের আখড়ায় এখন বাউলদের আর যাতায়াতের উপায় নেই । বাংলাদেশের জামাত সে আখড়া দখল করে মসজিদ বানিয়ে যা কান্ড করেছেন তাতে বাউলেরা ও লালনপন্থীরা ওমুখো আর হন না । অন্যত্রও বাউল ফকিরকে নানা পক্ষের ধর্মোন্মাদেরা দু-দেশেই খুব স্বস্তি দেন না । দু-দেশের বাউলদের একটা স্বাধীন মিলনক্ষেত্র ছিল কদমখালির লালনতীর্থের এই মেলাটি ।

মানিক সরকার নামের এক ভাবুক ও কর্মবীর এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা । তিনি অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন 'মানবমৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে নিবেদিত লোককবি লালন ফকিরের স্মরণে' পশ্চিমবঙ্গে একটা মেলা চালু হোক । তিনি আসাননগর, ভীমপুর, কদমখালি এসব এলাকায় দীর্ঘকাল ঘুরে ঘুরে মানুষদের সংগঠিত করেন । ওপারেই কুষ্ঠিয়াতে লালনের থান, ফলে অঞ্চলের গ্রামের মানুষরাও পুরুষানুক্রমিকভাবেই লালনকে ভালোবেসে এসেছেন । অন্নদাশঙ্কর চিঠি লিখে বললেন, 'আমি সর্বান্তঃকরণে লালন মেলার সাফল্য কামনা করি । লালন মেলায় পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ভেদ নেই । এটি আমাদের জাতীয় মেলা ।' গ্রামবাসীরাও এই উদ্যোগে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন । সভা করে ঠিক হলো এ মেলায় 'জাতপাত, ভেদচিন্তা, দলীয় রাজনীতিকে কোনো প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না । ... সকলের উপরে মানুষকে স্থান দিতে হবে । মানুষের ধর্মপালন করতে হবে । লালনের মনুষ্যত্ব অন্তর দিয়ে অনুসরণ করতে হবে' (প্রথম সভার সিদ্ধান্তপত্র) ।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লালনপ্রেমী অধিকাংশ মানুষ এ মেলায় গত ১৭-১৮ বছর নিয়মিত এসেছেন । গতবছরও প্রায় সাড়ে তিনশ বাউল এসেছেন । একসঙ্গে চারটি মঞ্চে গান হয়েছে । কমপক্ষে এক-একদিন চল্লিশ হাজার গ্রামবাসী গান শুনেছেন । গ্রামের লোক চাঁদা তুলে, মুষ্টিভিক্ষা করে বাউলদের থাকা খাওয়ার ও অন্যান্য ব্যবস্থা করেছেন । কোনো সরকারের বা দলের সাহায্য ছাড়াই সবাই মিলে 'লালন মেলা সমিতি'র নেতৃত্বে একেবারে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-এর দৃষ্টান্ত ধরে এসব কাজ করেছেন । যে স্তরের গান এ মেলায় শোনা যেত, যেভাবে ছিন্নবাস ভিখারিণীরাও গর্বিত মাথাটি তুলে রাত দুটোতেও ভুবনমোহিনী সুর লাগাতেন এবং গহনতম পল্লীর ধনীদরিদ্র নির্বিশেষ সবাই তন্ময় হয়ে সে গান শুনতেন, সে দৃশ্য আর কোথাও দেখা যাবে কিনা জানি না ।

এই মেলা এবছর দখল করেছে সিপিএম । পুলিশ, সভাধিপতি, লোকাল কমিটি সব লেগে থেকে প্রতিটি কমিটি ও প্রতিটি মঞ্চের অধিনায়কত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে গত একবছর ধরে পার্টির সুনিপুণ পরিকল্পনা অনুসারে । এই মেলা দখলের প্রক্রিয়াটি নিয়ে চমৎকার একটি গল্প 'অচিন পাখি' 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছে ১৭ই জুন ২০০৭-এ । মানিক সরকারদের মেলা কেড়ে নেবার ঐ গল্প পড়েও আমরা কেউ বিশেষ প্রতিবাদ করিনি । ফলে ডিসেম্বরে (২০০৭) দখলীকৃত মেলা বসলো । মন্ত্রী ও সভাপতিদের বক্তৃতায় ও বামফ্রন্টের জয়গানে মেলাস্থল প্রকম্পিত হল । সুব্রত বিশ্বাস নামের একজন লালন মেলা সমিতির নতুন সাধারণ সম্পাদক হয়ে স্মারকগ্রন্থে সার্টিফিকেট দিয়েছেন - 'লালন

আজকেও প্রাসঙ্গিক' । সম্পাদক আরো লিখেছেন 'দরিদ্র নিপীড়িত, বিভক্ত, হতমান মানুষগুলোকে (লালন) লড়াইয়ের হাতিয়ার দেন ।'

দখল করবার প্রক্রিয়াটি খুব সরল । কার্যকরী সমিতি থেকে পুরনো কাউকে সরানো হয়নি । পুরনো সবাই আছেন । গত বছর (২০০৬) সাধারণ সদস্য ছিলেন ৯ জন । এ বছর (২০০৭) শুধুমাত্র সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১ জন । নতুন ২০ জনই সিপিএমের লোক, ফলে পুরনো মেলা কমিটি থেকেও থাকলেন না । পার্টির লোকেরা লালন সমিতিতে এখন যাই বলেন, নবাগত কুড়িজন তাতে হাত তোলেন । কে গাইবেন, কে বলবেন, কে চায়ের দোকান দেবেন সব ওনারা ঠিক করেন । এভাবে সব গুরুত্বপূর্ণ সাবকমিটি দখল হয়ে মেলার চরিত্রহনন সম্পূর্ণ হয়েছে ।

প্রথমদিন মঞ্চে ওঠা দূরাগত বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ রাজনীতির দখলদারির প্রতিবাদ করে ব্ল্যাকলিস্টেডও হয়েছেন । সুভেনিয়রের সম্পাদক কলকাতার বড় ডাক্তার । তাঁকে মেলা কমিটি সম্ভবত বাগে আনতে পারেন নি । তিনি লিখেছেন - 'লালনমেলায় শুরুতে রাজনীতি ... ছিল না ।' এখন সে 'কালো ছায়া' পড়েছে । এসব পড়ে মেলার প্রথম দিনেই তড়িঘড়ি সমস্ত সুভেনিয়র পার্টি বাজেয়াপ্ত করেছে । ওদিকে বয়োবৃদ্ধ মানিক সরকার মশাই দৈনিক স্টেট্‌সম্যানকে বলেছেন - 'আর যাব না ...। গুণী মানুষরা ওদের কাছে ব্রাত্য, উচ্ছিষ্টদের ভিড় । দলীয় রাজনীতির দাপট, বাতাসে আঁশটে গন্ধ ।'

এ হেন 'মার্কসবাদী' লালনের জন্য বাউলসমাজের আগ্রহ কিন্তু একেবারেই জাগেনি । এবার মাত্র ৮০/৮৫ জন বাউল এসেছেন এবং অনেকেই বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছেন । মেলার মাঠে সেই জনসমুদ্র নেই । দিকে দিকে মেলা দখলের বার্তা রটে গেছে । কমিউনিটি ক্যান্টিনের রান্নাবান্না আগের মতো হয় নি । কারণ বাউল নেই, নেতারা ওসব মলম-টলম খান না ।

প্রশ্ন জাগছে, সিপিএম এটা কেন করলো ? এটা কি বাউল-ফকিরের কণ্ঠরোধ করবার সেই পুরনো চেষ্টার একটা নবরূপায়ন যাতে মৌলবাদ তুষ্ট হয় ? নাকি জনসমুদ্রে ভোট ভিক্ষার সুযোগ সন্ধান ? যাই হোক, এটা আদপেই লালনপ্রেম নয় । লালনে নিবেদিত মানুষদের তুচ্ছ করে লালনপ্রেম হয় না । যে মানুষরা গড়ে তোলেন সেই মানুষদের কর্মে হস্তক্ষেপ হলে বরং দেশের গভীরতম ক্ষতি হয় ।

[উৎস মানুষ, জানুয়ারি ২০০৮]